র‍্যাবস দত্ত
থ্রিলারসমগ্র

রবিশংকর বল

ঐতিহ্য

পার্লরহস্য

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, আমার ডিটেকটিভ হওয়ার পিছনে আর কোনো কারণ ছিল না, শুধু একটি স্বপ্ন। হ্যাঁ, একটা স্বপ্ন দেখার পর ঘুম থেকে জেগে আমার মনে হয়েছিল, ডিটেকটিভ হওয়াই আমার একমাত্র কাজ বা বলা যাক, নিয়তি। আপনারা অনেকেই, আমি জানি, নিয়তিতে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, নইলে একটা স্বপ্ন দেখে তো কেউ ডিটেকটিভ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় না। নিয়তি কী? নিয়তি কেমন? শুধু একটা ছবি দেখতে পাই আমি। অন্ধকার ছাদে তারে ক্লিপ দিয়ে ঝোলানো একটা হলুদ রুমাল হাওয়ায় উড়ছে। তিনতোরেত্তোর ছবিতে যেমন হলুদ দেখা যায়, সেরকম হলুদ। কেন? ভাষা তা প্রকাশ করতে পারে না। কোথায় যেন শুনেছিলাম, পৃথিবী থেকে যে-সব ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের কারো কারো রংকে নাকি ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা ছিল। আমি তাই কিছুদিন লুপ্ত ভাষা নিয়ে এলোমেলো পড়াশোনাও করেছিলাম।

স্বপ্নটার কথাই বলা যাক। এমন কিছু গোলমেলে, জটিল স্বপ্ন নয়। আমি একদিন একটা সিনেমা হলের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। স্বপ্নের ভিতরে, বুঝতেই পারছেন, একটা ভুতুড়ে, পরিত্যক্ত সিনেমা হল, যেখানে আর সিনেমা দেখানো হয় না। এরকম একটা সিনেমা হল, নাম 'রূপায়ণ', আমাদের অঞ্চলে অনেকদিন অবধি মৃত, নিষ্পত্র গাছের মতো দাঁড়িয়েছিল। মা এবং পাড়ার মামি-মাসিদের সঙ্গে ছোটবেলায় আমি সিনেমা দেখতে যেতাম। দোতলা ছিল মেয়েদের জন্য। পঁচাত্তর পয়সার টিকিট। তখন সিনেমা শেষ হলে পর্দায় জাতীয় পতাকা উড়ত আর 'জনগণমন অধিনায়ক' শোনা যেত। দর্শকরা সে সময় উঠে দাঁড়াত। ষাট আর সত্তরের প্রথম দিক ঘোর জাতীয়তাবাদের সময়। কিছু মনে করবেন না, কথা বলাটা এমন এক বহতা নদীর মতো, যে স্রোত প্রতিস্রোতের টানাপোড়েন চলতেই থাকে। আমি জেনেছিলাম, সেদিন ওই সিনেমা হলে এডগার অ্যালান পো-র 'দ্য পারলয়েনড লেটার' গল্পটা নিয়ে তৈরি ছবি দেখানো হবে। কিন্তু আর কোনো

দর্শক নেই, আমি একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, সমীর আসছে। সমীর আর আমি একসময় যে কত সিনেমা দেখেছিলাম, গুনে শেষ করা যাবে না। দুজনে সিনেমা বানানোর কথাও ভেবেছিলাম, কতদিন যে তা নিয়ে কথা বলেছি! সমীরকে বললাম, 'সিনেমা দেখবি তো?'

—কিন্তু আমি বড় মুশকিলে পড়েছি রে।

—কী?

—ডেথ সার্টিফিকেটটা খুঁজে পাচ্ছি না।

—কার?

—আমার। তুই জানিস কোথায় আছে? খুঁজে দেখবি? আমার খুব দরকার।

আমার ঘুম ভেঙে গেল। জানলার ওপারে হালকা কুয়াশা-মাখা ভোর। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। গাছেরা হাওয়ার সঙ্গে মাথা দোলাচ্ছে। সমীর চার বছর আগে মারা গেছে। এরকমই এক ভোরবেলা টেলিফোন বেজে উঠেছিল। ওপারে সমীরের বউ রীতার কণ্ঠস্বর, কান্নায় ক্ষতবিক্ষত, 'রবিদা, সমীর আর নেই।'

—মানে?

হাওড়ায় ওর কারখানা থেকে মাঝরাতে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল সমীর। এক দুরন্ত লরি ওর বাইকটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আমরা হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে সমীরের মৃতদেহ শনাক্ত করি ও তাকে অগ্নিমণ্ডলে প্রবেশ করিয়ে যে যার ঘরে গিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন, এ-নিয়ে গল্প ফাঁদার কোনো অবকাশ নেই। বহুদূর বেড়াতে গিয়ে, ট্রেনের জানলা দিয়ে, আমরা এমন এক একটা বড় শিলাখণ্ড দেখি না, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী কী আশ্চর্যভাবে গড়িয়ে না গিয়ে স্থির, সমীরের মৃত্যুও আমার কাছে তেমনই! বা বিমানের জানলা দিয়ে দেখা একটি অত্যাশ্চর্য মেঘখণ্ড সাদা মেঘপুঞ্জের মাঝে শুধু সেই মেঘটির শরীরেই রক্তাভা। কোন্ গোপন থেকে এই রক্ত এসে ছড়িয়ে পড়েছে ওই মেঘখণ্ডের শরীরে? ডাইগ্রেসন। এই যে কথা বলতে বলতে আমরা পিছিয়ে যাই, হয়তো সেজন্যই আমরা বেঁচে থাকি, মনে হয় না আপনাদের? আমরা এক পা এক পা করে মৃত্যুর দিকে এগোই, আর জীবন যেন কোনো অতীতে এক ভোমরার হৃদয়ে লুকিয়ে থাকে। ধরা যাক, একটা সাঁকো। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে সরস্বতী নদী। সাঁকোর দুই দিকে রাস্তা চলে গেছে ধানখেত আর গাছপালার মধ্য দিয়ে। দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি, নূপুর আর বেবি। ওরা সম্পর্কে আমার ভাগনি, কিন্তু সমবয়স্ক। আমি সাঁকোর বাইরে পা বাড়িয়ে দোলাচ্ছি, আর তখনই পা থেকে খসে পড়ে গেল চটি।

আমরা দেখলাম, সরস্বতীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে এক কিশোরের ছোট্ট একপাটি চটি। দেখুন, এভাবেই জীবন চলে যাচ্ছে, কেবলই এক মৃত্যুর হাতে আমাদের বেঁচে থাকার খুঁদকুড়ো তুলে দিয়ে।

সমীর ওর ডেথ সার্টিফিকেটটা খুঁজে পাচ্ছে না। স্বপ্নে এসে ওই যে বলে গেল, 'তুই জানিস, কোথায় আছে? খুঁজে দেখবি? আমার খুব দরকার', তারপরেই আমি ডিটেকটিভ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, একজন মৃত মানুষ, স্বপ্নে এসে কেন তার ডেথ সার্টিফিকেট খোঁজবার কথা বলে। এও এক আশ্চর্য রহস্য। আমাদের স্বপ্নে মৃত মানুষেরা তো কতই আসে, আমি কারো কাছে শুনিনি, কোনো মৃত তার ডেথ সার্টিফিকেট খুঁজতে এসেছে। একজন মৃত কী করেই বা ডেথ সার্টিফিকেটের কথা জানতে পারে? এই রহস্যও তো উন্মোচিত হওয়া দরকার। ফলে ডিটেকটিভ হওয়া ছাড়া আমার ভবিতব্য আর কীই বা হতে পারত।

সেদিনই বিকেলে, আমার কবিবন্ধু নির্বাণের কাছে গেলাম। অফিস ফেরত মাঝে মাঝেই এটা আমার অভ্যাস। নির্বাণও আমার মতোই ব্যাচেলার। তবে আমি আমাদের সিমলের পুরোনো বাড়িতে মাকে নিয়ে আর নির্বাণ একা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে যাদবপুরে থাকে। একেকদিন সন্ধ্যায় আমি ছাড়াও নির্বাণের ফ্ল্যাটে আরও দুয়েকজন জুটে যায়। তারা নির্বাণের কবিতা শুনতে চায়। নির্বাণও পড়ে শোনায়। তাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু নির্বাণের পয়সায় মদ খাওয়া। আমিও খাই, কিন্তু নির্বাণের কবিতা নিয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই। এই জন্যই একেক সময় নির্বাণ আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা এইরকম যে আমার পয়সায় মাল খাচ্ছ, আমার প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিচ্ছ না? বেশ কয়েকবার সান্ধ্য মদের আসর থেকে নির্বাণ আমাকে মাঝপথে প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে। এতে আমি কখনোই অপমানিত বোধ করিনি। বরং মনে হয়েছে, নির্বাণ কবি, সে নিজেকে প্রতিভাবান মনে করে, অতএব এটুকু স্বেচ্ছাচারী হওয়ার অধিকার তার আছে। আর আমার দিক থেকে যুক্তিটা এই যে অন্যের পয়সার মাল খেতে হলে অপমান-ফান গায়ে মাখলে চলে না। একটা ক্যুরিয়ারের কোম্পানিতে চাকরি করে যা রোজগার তাতে মা আর ছেলের কোনোমতে চলে যায়। নিজের পয়সায় মদ খাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। নির্বাণ স্কুলে পড়ায়, ভালো মাইনে, একা ঝাড়া হাত-পা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদের আড্ডা বসানোর বিলাসিতা সে করতে পারে। আর বিলাসী মানুষ তো একটু উদ্ধত হবেই, তাই না?

নির্বাণের ফ্ল্যাটে সেদিন ওর এক পুরোনো বন্ধু এসেছিল। সেও কবি। নির্বাণের বাড়িতে এত কবি দেখতে দেখতে আমার অনেকবার মনে হয়েছে,

কবিরা কি রেললাইনের ধারের ল্যানটানা ক্যামারার মতো ঝাড়ে ঝাড়ে জন্মায়? নির্বাণ ওর বন্ধু অমিতকুমার সরখেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অমিত সরখেল একটা এমএনসি-তে সেলসের উঁচুপদে চাকরি করে। দু-বছর হয়ে গেল বম্বেতে আছে। তার স্ত্রী অবশ্য কলকাতায় থাকে। নির্বাণ ও অমিত সরখেলের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হচ্ছিল, তা এইরকম—

অমিত : তুই তো জানিস, সি ইজ ভেরি মাচ কোল্ড। রূপার সঙ্গে আর থাকা যায় না। তার ওপর আমার লেখালেখির প্রতি ওর কোনো শ্রদ্ধাই নেই।

নির্বাণ : তাহলে কাবেরীকেই বিয়ে করবি ভাবছিস?

অমিত : ওর সঙ্গে ভাইবে মেলে। আর কাবেরী কালচারালি কতটা এনগেজড্ তা তুই জানিসই।

নির্বাণ : ফাইন। মিটে গেল। এর মধ্যে সমস্যা কোথায়?

অমিত : আমার মনে হচ্ছে, কিছুদিন হলো রূপার কারোর সঙ্গে অ্যাফেয়ার তৈরি হয়েছে।

নির্বাণ : তাতে তোর কী? তুই তো ডিভোর্স নিতেই চাইছিস।

অমিত : সার্টেনলি। কিন্তু অ্যাফেয়ারটার ব্যাপারে জানতে পারলে, আমার দিক থেকে কেসটা অনেক জোরদার হয়।

নির্বাণ : তুই কী করে জানলি, রূপা কারোর সঙ্গে ইন্টুমিন্টু করছে?

অমিত : অমিত সরখেলের চোখ এড়িয়ে কিছু করা যায় না নির্বাণ। কাজের মেয়েটাকে অনেকদিন ধরেই টাকা দিয়ে ফিট করে রেখেছি।

নির্বাণ : শুধু টাকা দিয়ে? বিছানায় নিসনি?

অমিত : ও কিছু না। টুকটাক। ওর কাছ থেকেই সব খবর পাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে কথা বলে যায়। সপ্তাহে তিন-চারদিন দুপুরে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত করে। এভিডেন্স আমার চাই-ই নির্বাণ।

নির্বাণ : কী করবি? তুই বম্বেতে আর রূপা এখানে। তুই ধরবি কী করে?

অমিত : সেটাই তো ভেবেছি। একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে কাজে লাগাব ভাবছি। তুই একটা ভালো এজেন্সি খুঁজে বার কর। আরও তিনদিন তো আছি। ফিট করে চলে যাব।

নির্বাণ : লাও ঠ্যালা, এখন আমাকে ডিটেকটিভ খুঁজতে হবে?

এক চুমুকে এক গ্লাস শেষ করে সিগারেট টানতে টানতে নির্বাণ পায়চারি করতে লাগল। আমি ওদের কথার ফাঁকে বেশ বড় দুটো পেগ বানিয়ে মেরে দিয়েছি। আর ওদের কথা শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, আমার ডিটেকটিভ-জীবনের প্রথম কেসটা একেবারে হাতের মুঠোয়।

নির্বাণ বিড়বিড় করছিল, 'কাগজে তো কত ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দেখেছি... একটু নজরে রাখতে হবে।'

—খুব রিলায়েবল আর এফিশিয়েন্ট হওয়া দরকার। অমিত সরখেল বলে।

আমার দিকে তাকিয়ে নির্বাণ বলে, 'রবিবাবু, আপনি এমন কোনো এজেন্সির খোঁজ জানেন?'

—খোঁজা যেতে পারে।

—কালকের মধ্যে খুঁজে বার কর তো।

আমি আর একটা পেগ বানিয়ে নিলাম। চুমুক দিতে দিতে ভাবছিলাম, প্রস্তাবটা তুলব কি তুলব না? নির্বাণের মুখ থেকে খিস্তির বান বয়ে যেতে পারে, আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বার করে দিতে পারে। পেগটা শেষ করে সিগারেট ধরালাম। গোল গোল ধোঁয়ার রিং বেরোতে থাকল আমার মুখ দিয়ে। ধোঁয়াবৃত্তের ভিতরে আমি আবার সমীরকে দেখতে পাচ্ছিলাম...ওর কথাও শুনতে পাচ্ছিলাম...'ডেথ সার্টিফিকেটটা খুঁজে পাচ্ছি না। তুই জানিস, কোথায় আছে? খুঁজে দেখবি? আমার খুব দরকার।'

—নির্বাণ—

—বল।

—কাজটা কিন্তু আমি করতে পারি।

—মানে?

—রূপাদেবীকে ফলো করার কাজটা।

—পাগলাচোদা। নির্বাণ চেঁচিয়ে ওঠে।

অমিত সরখেল তার ঠোঁটে ধারালো হাসি বুলিয়ে বলে, 'আপনি ডিটেকটিভ নাকি?'

আমি হেসে বলি, 'ছিলাম না। আজ থেকে হয়েছি।'

—মানে! নির্বাণ আমার সমনে এসে দাঁড়ায়।—'ক'-পেগ খেয়েছিস? আজও কি শালা লাথি মেরে বার করতে হবে?

উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে আমি নির্বাণের কাঁধে হাত রাখলাম। নির্বাণ আমার চেয়ে লম্বা। দৃশ্যটা খুবই হাস্যকর দেখাচ্ছিল। কিন্তু জানতাম, আজ আমি ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারব। আজ সকাল থেকে আমার একটা তৃতীয় নয়ন তৈরি হয়েছে। আমি ডিটেকটিভ হয়ে গেছি। জীবনের একটা

ডিটেলও আর আমার চোখ এড়িয়ে যাবে না। যে-ঘটনা, যে-কথা, যে-বস্তুর দিকে অনেকে নজর দেয় না, আমাকে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

নির্বাণ হেসে ফেলে, 'মাল বেশি খেয়ে ফেলেছিস?'

—নির্বাণ, মানুষকে অপমানের পর অপমান করতে করতে, এত নোংরা লোকজনের সঙ্গে থাকতে থাকতে— আমি আজ বলেছি, তোদের এই কালচারের জগতে এত নর্দমার কীট— অনেক বছর তোর সঙ্গে মাল খেতে খেতে দেখছি তো—কীটস্য কীট সব— এদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তুই কী করে কবি হলি আমি জানি না। কবি কিনা, তাও জানি না।

—মানে?

—আমার কথা একটু শোন। আজ সকালে একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেল। তখনই ঠিক করি, আমি ডিটেকটিভ হব।

আরে, রবিবাবু যে আমাদের চেয়েও বড় কবি। অমিত সরখেল হা-হা করে হাসতে থাকে।

—কী স্বপ্ন দেখলি?

স্বপ্নটার কথা শুনে নির্বাণ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ওর প্রশস্ত বুকে আমাকে জাপটে ধরে বলল, 'তুই শালা পাগল হয়ে গেছিস। আজ আর মাল খাস না।'

—আমাকে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, অমিতবাবু। আমি বলি।

—তুই কি পাগল?

—প্লিজ নির্বাণ, একবার আমাকে সুযোগ দে।

—তোর চাকরি-বাকরি আছে—

—আমি একমাস ছুটি নেব। সাকসেসফুল হলে নিজেই এজেন্সি খুলব, নির্বাণ।

—ডান্। অমিত সরখেল সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

—তুইও পাগল হলি নাকি? নির্বাণ আমাদের দুজনের মুখের দিকে ফিরে তাকায়।

অমিত সরখেল গম্ভীর গলায় বলতে থাকে, 'নির্বাণ, এক সময় তো আমরা বলতাম, লেখা আসলে খেলা। লেখার খেলা। আমাদের জীবন থেকে, লেখা থেকে খেলাটা অনেকদিন হারিয়ে গেছে। লেটস্ স্টার্ট দ্য গেম এগেন। রবিবাবু আমার বাজি। রবিবাবু আমার অ্যাপয়েন্টেড ডিটেকটিভ। আপনি ফিজ কত নেবেন?'

—এক মাস ছুটি নেব। মা আর আমার যাতে চলে যায়, সেটুকু হলেই হবে।

—কত !

— হাজার দশ-বারো ।

— আমি আপনাকে কুড়ি হাজার দেব । ফলো করার জন্য তো খরচ আছে ।

নির্বাণ হঠাৎ হা-হা করে হাসতে থাকে । তার হাসি থামতেই চায় না, আমি ও অমিত সরখেল নির্বাণকে ধরে ঝাঁকাতে থাকি ।

—কী হলো? আরে এত হাসির কী আছে?

—একটা কবিতা মনে পড়ছে ।

—কার?

—রোবের্তো বোলানিওর । তুই পড়েছিস অমিত?

—লোকটার নাম শুনেছি । পড়া হয়নি ।

—'রোমান্টিক ডগস্' নামে বোলানিওর একটা কবিতার বই আছে । ওখানে ডিটেকটিভদের নিয়ে বেশ কয়েকটা কবিতা আছে । তুই সৌরভ দে সরকারের নাম শুনেছিস?

—নর্থ বেঙ্গলের ছেলে তো?

—হ্যাঁ । ও বোলানিওর কবিতার অনুবাদ করেছে ।

নির্বাণের পাশের ঘরে গিয়ে একটা পাতলা বই হাতে নিয়ে ফিরে আসে । আর সে বোলানিওর কবিতার অনুবাদ কর্কশ জড়ানো গলায় পড়তে থাকে—

এই অন্ধকার শহরে হারিয়ে যাওয়া গোয়েন্দাদের
স্বপ্ন দেখতাম আমি
তাদের গোঙানি, তাদের বিরক্তি
তাদের চলে যাওয়ার বিবৃতি
দুজন চল্লিশ না পেরোনো চিত্রকরের
স্বপ্নও দেখেছিলাম যখন
কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করছিলেন, ওই সময়ের
(একজন ধ্রুপদি আর অন্যজন একতাল গোবরের মতো আধুনিক)
আমি ওই জ্বলন্ত পায়ের ছাপগুলোর স্বপ্ন দেখেছিলাম
সরীসৃপের বুকে হেঁটে যাওয়ার চিহ্ন
আসলে ওইগুলোই খুঁজে বেড়াত গোয়েন্দারা
ওইসব সাহসী, প্রত্যয়ী গোয়েন্দারা
একটি জটিল বিষয়েও স্বপ্ন দেখেছিলাম একদিন
মৃতদেহে উপচে উঠছিল করিডোর
অমীমাংসিত সব জেরা
কলঙ্কিত আর্কাইভ

আর এই গোয়েন্দাটিকেও দেখেছিলাম
খুব দ্রুত অকুস্থলে ফিরে আসতে
শান্ত আর একদম একা
জঘন্য দুঃস্বপ্নগুলোর ভেতরেও দেখতাম
রক্তে ভেসে যাওয়া বেডরুমে
সে এক একা বসে আছে আর সিগারেট ফুঁকছে
আর ঘড়ির কাঁটা কোনোমতে কাঁপতে কাঁপতে
অনন্ত রাত্রি ফুঁড়ে এগিয়ে চলেছে।

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এভাবেই, শুধু একটা স্বপ্নের জেরে, একদিনেই আমি ডিটেকটিভ হয়ে গিয়েছিলাম। রাতে, বাড়ি ফিরে মাকে খবরটা জানাই। বলি, একমাসের জন্য চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে আমি ডিটেকটিভগিরি করব। তোমার আপত্তি আছে?

মা হেসে বলেছিল, 'এবার কি তাহলে সত্যবতী আসবে?'

—ধুর, কী যে বল! তুমি-আমি বেশ আছি।

দুই

এরপর ঘটনা ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলবে, বুঝতেই পারছেন। তার আগে, একটি বিষয় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। ক্যুরিয়র কোম্পানির চাকুরে রবিশেখর দত্ত গোয়েন্দা হিসেবে র‍্যাবস দত্ত হয়ে গেল। এ-নামটা আমার তৈরি করা নয়। আমার ভাগনি তাথৈ, তার বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়, হলফ করে বলতে পারি, ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের পোকা। আমি ওকে ফোন করে বলি, 'তা তা থৈ, আমার একটা নতুন ভূমিকা তৈরি হয়েছে। সেই লোকটার জন্য একটা নাম দরকার।'

—কেন কী করছ তুমি?

—আমি ডিটেকটিভ হয়েছি।

তাথৈ খিলখিল করে হাসতে থাকে।— গ্রেট মামু। কোনো কেস পেয়েছ?

—প্রথম দিনেই। কিন্তু ডিটেকটিভ হিসেবে আমার নামটা তোকে ঠিক করে দিতে হবে।

—একদিন তো ভাবতে দাও।

—তাড়াতাড়ি করিস।

তাথৈ একদিনও নেয়নি। সেদিনই রাতে ফোন করে বলে, "মামু, তোমার নাম পেয়ে গেছি।'

—বল— বল—

—র‍্যাবস দত্ত।

—মানে?

রবিশেখর থেকে র‍্যাবস। আরএবিআইএসইকেএইচএআর। রবি থেকে আরএবি নাও, শেখর থেকে এস। র‍্যাবস। ব্যাপক মামু। ইয়াম্মি।

—ইয়াংচু।

এর কোনো মানে নেই। তাথৈ কোনো কথার পর ইয়াম্মি বললেই আমি ইয়াংচু বলি। তাথৈ-এর জন্মদিনের কেক কাটার পর আমরা দুজন নাচবই নাচব, প্রতিবার, তাথৈ বলবে ইয়াম্মি, আর আমি বলি ইয়াংচু।

—তোমার তো অজিত বা ড. ওয়াটসন দরকার। তাথৈ গম্ভীর গলায় বলে।

—কাকে পাই বল তো?

—আমাকে নাও।

—উহুঁ। শুরুর কেসটাই বড়দের। এ-জগতে এখনই তোর ঢোকা ঠিক হবে না। বড়রা কত হিংস্র, তুই জানিস না?

—তুমি তাহলে কত ছোট?

—আমিও খুব হিংস্র। তুই জানিস না। কোনো মজার কেস এলে তোকে অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নেব, কথা দিলাম।

— গুড লাক। গো অ্যাহেড, র‍্যাবস্ দত্ত।

স্বপ্নে সমীরকে দেখা, তার পরদিন র‍্যাবস্ দত্তর জন্ম, এবং তারও দু-দিন পর সকালে আমার মোবাইল বেজে উঠল। শীতের সকাল। আমি পুরোনো কাঁথার ওমের ভিতরে শুয়ে মোবাইল আঁকড়ে ধরলাম। একজন মহিলার কণ্ঠ ওপার থেকে।

—রবিশেখর দত্ত?

—নো। আয়াম র‍্যাবস্ দত্ত।

—নাম্বারটা রবিশেখর দত্তর, তাই তো জানি

—ঠিক জানেন।

—তাহলে?

—এখন থেকে আমি র‍্যাবস্ দত্ত।

—ওকে। একই মানুষ হলে নামে কিছু আসে যায় না।

—নিশ্চয়ই আসে যায়, ম্যাডাম। রবিশেখর দত্ত একটা ক্যুরিয়র কোম্পানির চাকুরে, আর র‍্যাবস দত্ত একজন ডিটেকটিভ।

—আমি ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—সঠিকভাবেই বলছেন।

—আমার হাজব্যান্ডকে চেনেন?

—আপনি কে, তাই তো জানলাম না।

—আমি রূপা সরখেল।

—অমিতকুমার সরখেলের ওয়াইফ?

—তাহলে আমার হাজব্যান্ডকে চেনেন?

—বিলক্ষণ চিনি। আচ্ছা, স্বামী না বলে, হাজব্যান্ড বললে কী সুবিধে হয় ম্যাডাম?

—মানে?

—কিছু না। আপনি কী জানতে চান, বলুন।

—অমিত আমার পিছনে আপনাকে লাগিয়েছে?

—মানে?

—আমাকে ফলো করার জন্য?

—হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন?

—অমিতই বলেছে।

—বাঃ, বেশ তো।

—কেন? অবাক হচ্ছেন কেন?

রূপা সরখেলের হাসি শোনা যায়, যা অনেকটা সমুদ্রতটে ঘুরে বেড়ানো হাওয়ার মতো।

—অমিতবাবু আপনাকে ফলো করার জন্য আমাকে বললেন, আবার উনিই আপনাকে জানিয়ে দিলেন?

রূপা সরখেল আবার হেসে ওঠে।— এসব মালখোরদের আপনি চেনেন না, র‍্যাবস দত্ত। এরা বিছানায় একবার পাবার জন্য, সব বলে দিতে পারে।

—কিন্তু আপনি তো কোল্ড— ভেরি মাচ কোল্ড। অমিতবাবু এরকমই বলেছেন।

—একবার পরীক্ষা করে দেখবেন?

—মানে? কী বলছেন আপনি?

—কেন? আপনারা—পুরুষরা তো আকছার এমন কথা বলেন। আমি, একজন মেয়ে বলছি বলে আঁতকে উঠলেন?

—আপনাদের সমস্যাটা কোথায় বলুন তো?

—সেটা জানতে হলে তো আমার কাছে আসতে হবে।

—যাব, অবশ্যই যাব। আপনার কাছে তো আমাকে যেতে হবে। কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না, অমিতবাবু আপনাকে ফলো করার জন্য আমাকে ডেপুট করে, আমার ফোন নম্বর কেন আপনাকে দিয়ে দিলেন?

—এসব খেলা আপনি বুঝবেন না।

—কেন?

—আপনার অত টাকা নেই।

—মানে? সব বোঝার জন্য টাকার দরকার হয় নাকি?

—না। যে-জগতে অনেক টাকার লেনদেন হয়, সেখানকার খেলা আপনার বোঝার কথা নয়।

—কেন?

—আপনি সিমলের একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকেন তো? থাকেন না? আপনি আর আপনার মা।

—হুঁ।

—বদলে যাওয়া কলকাতাকে আপনি তো জানেনই না।

—কী রকম?

—কোনো নাইট ক্লাবে গেছেন? তন্ত্রায়?

—না। তবে, আমি তো ফুটপাথে-ফুটপাথে ঘুরেছি। সেই একই শহর। একই রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা মানুষ। একই ভিখিরি...ভবঘুরে....একই বেশ্যা...

—তন্ত্রা আজকের কলকাতার। ফুটপাথ অন্য কলকাতার। যাই হোক, 'আপনি কবে আসবেন?

—আজই আসতে পারি। কেথায়?

—ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। মাও-জে-দং রেস্তোরাঁয়। সাতটায় অপেক্ষা করব।

—থ্যাঙ্কস ম্যাম।

হাতে অনেকটা সময়। এই অবসরে আমার অন্য কলকাতা নিয়ে দু-একটা কথা বললে আপনারা নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন না। আমি জানি, একটা নতুন কলকাতা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। সেই কলকাতার একটা নামও আমি ভেবেছি। পেজ- থ্রি কলকাতা। কলকাতা টাইমস, টি-টু, এইচটি কলকাতা— এই সব কাগজে রোজ পেজ-থ্রি কলকাতাকে দেখা যায়। আমি অফিসে কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম। আসলে পেজ-থ্রি কলকাতাকে দেখতাম। যেন স্ট্রিপট্রিজের উৎসব। না, উৎসব কথাটা ঠিক হলো না, অরজি। পেজ-থ্রি কলকাতায় উৎসব থাকতে পারে না; অরজিতেই সে রোজ

জেগে ওঠে আর মরে যায়, আমার এমনটাই মনে হতো। এই পেজ-থ্রি কলকাতার সারা শরীরে কতরকম যে ট্যাটু আঁকা আছে। ট্যাটুগুলো তিনটি বিষয়েই ইঙ্গিত করে: টাকা, যৌনতা আর অপরাধ। অফুরান টাকা আর অবাধ যৌনতা। আর অপরাধ। টাকা ও যৌনতা নিয়ে খেলা যত জমতে থাকে, মানুষের অপরাধ করার ইচ্ছেও তত বাড়তে থাকে। আমি একটা শব্দ ভুল করে ফেললাম। 'অপরাধ' শব্দটা আমার অন্য কলকাতার জন্য তোলা থাক। পেজ থ্রি কলকাতায় এর নাম 'ক্রাইম'। আমি এই কলকাতার ঝলক দেখতে পাই, কিছু কিছু ছবির দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু রূপা সরখেল যেমন বলেছে, আমি এই পেজ থ্রি কলকাতার নাগরিক নই। পেজ থ্রি কলকাতার চোখে আমি একটা নিগার; অপুষ্টিতে ভোগা, তাগা তাবিজে জড়ানো নেটিভ।

এই সব কথা আমি নির্বাণকে কখনো বলিনি। নির্বাণ যদিও আমাকে 'নিগার' মনে করে না (হয়তো করে, তা-ও জানি না), তবু আমি যে তার চোখে একজন হাবা, ব্যর্থ মানুষ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমন একজন লোক, যে আর পাঁচজনের মতো অফিসে পচে মরে, বন্ধুর পয়সায় মাল খায়, তারপর রাতে গুটিগুটি পায়ে একশো বছরের পুরোনো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে ঘরে ফিরে যায়। এটাই আমার অন্য কলকাতা যা পেজ-থ্রি কলকাতার মানচিত্রের বাইরে। শতাব্দী- প্রাচীন একটা বাড়ি যা তাকে ঘিরে আরও সব পুরোনো বাড়ি বা নতুন গজিয়ে ওঠা অ্যাপার্টমেন্ট আর গলির পর গলির গোলকাঁধা। তিনতলা বাড়িতে এখন মাত্র দুটো পরিবার থাকে। একতলায় আমার বড় কাকারা। আর দোতলায় একটি ঘরে মাকে নিয়ে আমি। মেজোকাকা, ছোটকাকারা অনেকদিন আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বাড়িটার এখন পোড়ো-পোড়ো দশা, কিন্তু সারানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। বিক্রিও করা যাবে না, কেননা এ-বাড়ি দেবোত্তর সম্পত্তি। মন্দিরের নারায়ণ-শিলার মতো স্থবির আমরা কয়েকজন বেঁচে আছি কি নেই, বোঝাই যায় না। শুধু কয়েকটা পুজো-পার্বণে বাড়িটা জেগে ওঠে। দেবোত্তর সম্পত্তি তো, নমো নমো করে কিছু পুজোপাঠ আমাদের চালিয়ে যেতেই হচ্ছে। না হলে বাড়িতে থাকা যাবে না। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এই অন্য কলকাতায় রোজই দু-তিনজন ভূতের সঙ্গে আমার দেখা হয়। যাদবপুরে নির্বাণের সঙ্গে মদ খেয়ে ফিরতে ফিরতে প্রায়ই রাত বারোটা হয়ে যায়। গলিগুলো সব সুনসান, কোথাও হ্যালোজেন আলো, কোথাও সেই পুরোনো বালুবের হলুদ আলো। গলির পর গলি পেরিয়ে যেতে যেতে কতরকম ভূতের সঙ্গে যে এতদিনে দেখা হলো, কথা হলো, তা লিখলে ভৌতিক সিরিজ হয়ে যাবে।

তবে একজন ভূতের কথা আমি কখনো ভুলব না। তাঁর নাম জহরলাল ধর। ইনি লেখক-ভূত। আমার হাত চেপে ধরে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে বললেন, 'এক কপি কিনতেই হবে বাবাজি।'

—কী বই?

—এ বই আমি লিখেছি। *সচিত্র কলিকাতা-রহস্য*।

—কী রকম রহস্য?

—কলিকাতার কি রহস্যের শেষ আছে, বাপধন! পরতে পরতে রহস্য। তার খানকয়েক কথা এ-বইতে লেখা আছে।

—শুনি একটা রহস্য।

—সে কী? পথে দাঁড়িয়ে পড়া যায়?

—মাল কী আছে, না জেনে কিনিই বা কী করে?

—মাল? বইয়ের ভিতরে মাল?

—সব কিছুর ভিতরেই মাল আছে। পড়ুন একটা রহস্য।

—এসো, তবে ওই রোয়াকে বসি।

একটা বাড়ির বাইরের রকে গিয়ে বসি আমরা। জহরলাল ধর বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থেমে যান। হেসে বলেন, 'পঞ্চম পরিচ্ছেদটা পড়ি। এ হলো বাগবাজারের বোসপাড়া। রমেন্দ্রবাবুর বাড়ি। মন দিয়ে শোনো।'

জহরলাল ধর নাকি সুরে পড়তে শুরু করেন :

'বাগবাজার' শহরের মধ্যে একটি খাঁই জায়গা। প্রধান গেঁজেল দলের শ্রীপাঠ পূর্বে এইখানেই ছিল। আধুনিক পেশাদারি থিয়েটারের দল প্রথমত এই বাগবাজারেই জন্মগ্রহণ করে। বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর টাকা, ধর্মদাস সুরের বুদ্ধি, আর বঙ্গের প্রধান নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের বিদ্যার প্রভাবেই বঙ্গের জাতীয় রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর শরৎবাবু বঙ্গ-রঙ্গভূমির ভিত্তি স্থাপন ক'ল্লেন। ক্রমে স্টার, এমারেল্ড, সিটি, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটারে শহরে ভরে গেল। বঙ্গদেশের এখনও এরূপ অবস্থা হয় নাই যে, এই কয়টি রঙ্গভূমিকে পালন ও পোষণ ক'ত্তে পারে। কাজেই থিয়েটারের অধ্যক্ষবাবুরা ক্রমশই দেনাদার হয়ে পড়েন। অনেক ভদ্রলোক সর্বস্বান্ত হলেন; — বাড়ি গেল, ঘর গেল, বাগান গেল, বাপ্ পিতামহের নাম গেল, শেষে এখন জেলে নিয়ে টানাটানি। আজ কালের থিয়েটার বাস্তবিক দিল্লিকা লাড্ডু, 'যো খায়া সোবি পস্তায়া যো না খায়া সোবি পস্তায়া।' কারণ, থিয়েটারের বারবিলাসিনীগণই থিয়েটার ও দেশের উন্নতি ও অবনতির মূল। এ বিষয়ে থিয়েটার সম্প্রদায়ের বড় দোষ নাই, তবে দেশের লোকেরই প্রধান দোষ। এ